অসন্তোষই কৃষক বিদ্রোহের রূপে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

৩. মোগল শাসকশ্রেণির সংগঠন

মোগল সাম্রাজ্যের বিকাশ ও বিস্তারে শাসকশ্রেণির ভূমিকা

মোগল বাদশাহদের উদ্ভাবিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম অভিজাত তথা শাসকশ্রেণির সংগঠন। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের রূপায়ণ, রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামরিক কর্তব্য সম্পাদন, সামাজিক মান বজায় রাখা, এমনকি সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব পর্যন্ত বহুলাংশে নির্ভর করত এই প্রতিষ্ঠানটির যথাযোগ্য কর্তব্য সম্পাদনের ওপর। ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, সম্প্রসারণ ও সংহতিবিধানে শাসকশ্রেণি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই শাসকশ্রেণির ওপর এমন সব আঘাত আসে যে তাদের সংহতি বিনষ্ট হয় ও পরিশেষে মোগল সাম্রাজ্যকেও ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

শাসকশ্রেণির দুর্বলতা সাম্রাজ্যের পতন সূচিত করে

আকবরের পূর্বে শাসকশ্রেণিকে সংগঠিত করার চেষ্টা বিশেষ হয়নি। আকবরই প্রথম মনসবদারি প্রথার মাধ্যমে এই কাজটি করার উদ্যোগ নেন। এই প্রথা অনুসারে প্রত্যেক পদস্থ আমলাকে কিছু না কিছু সামরিক দায়িত্ব পালন করতে হত। অতএব মোগল শাসকশ্রেণির গঠন ছিল সম্পূর্ণ সামরিক ধাঁচের। এর প্রধান ভিত্তি ছিল বাদশাহের প্রতি ব্যক্তিগত আনুগত্য। সব মনসবদার প্রধানত সামরিক পদাধিকারী হওয়ায় বাদশাহের প্রতি তার আনুগত্য নির্ভর করত বাদশাহের ব্যক্তিগত গুণাবলি ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের ওপর। এম. এন. পিয়ারসন মন্তব্য করেছেন মোগল বাদশাহ ও মনসবদারের মধ্যে যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা হল পৃষ্ঠপোষক ও পোষ্যবৃন্দের সম্পর্ক (Patron-client relationship)। কোনো ধর্মীয় বা জাতিগত আনুগত্য বাদশাহ ও মনসবদারের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেনি। এই সম্পর্কের স্থায়িত্ব নির্ভর করত সাম্রাজ্য ও সম্পদের নিরন্তর বিস্তারের ওপর। সেইজন্য উভয়ের সম্পর্ক ছিল ব্যক্তিগত ও সামরিক চরিত্রের। যুদ্ধক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্যের দ্বারা আকবর শাসকশ্রেণির আনুগত্য অর্জন করেছিলেন। শাহজাহানের

মনসবদারি প্রথার মাধ্যমে শাসকশ্রেণির সংগঠন

বাদশাহ ও শাসকশ্রেণির সম্পর্ক সামরিক ও ব্যক্তিগত আনুগত্যের ভিত্তিতে

Scanned by CamScanner

আংশিক সাফল্য এই আনুগত্যকে শিথিল করে তুলেছিল। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করে ১৬৬০ থেকে ১৬৬৬ খ্রি. পর্যন্ত নিরন্তর যুদ্ধাভিযান চালিয়ে নিজেকে পিতার চেয়ে যোগ্যতর সেনাপতি হিসাবে প্রতিপন্ন করে শাসকশ্রেণির আনুগত্য আদায়ের চেষ্টা করেন। পরবর্তীকালে দাক্ষিণাত্যে তাঁর সামরিক অসাফল্য এই আনুগত্যে চিড় ধরায়। ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে সাম্রাজের ব্যয়ভার বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে সম্পদ বৃদ্ধি পায়নি। ফলে অর্থনৈতিক সংকট প্রকট হয়ে ওঠে। মনসবদারগণ তাদের জাগীর থেকে প্রাপ্য অর্থ আদায় করতে ব্যর্থ হয়। বাদশাহ ও শাসকশ্রেণির মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কটি নষ্ট হয়ে যায়। শাসকশ্রেণির অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক দুর্বলতাগুলিও প্রকট হয়ে উঠতে থাকে।

বাদশাহের যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্যের ওপর আনুগত্য নির্ভর করত

অর্থনৈতিক সংকটে শাসকশ্রেণির সংহতি বিনষ্ট

মোগল শাসকশ্রেণির দুর্বলতা তার গঠনের মধ্যেই নিহিত ছিল। পদস্থ আমলাদের নিয়োগের ক্ষেত্রে সাধারণত বংশমর্যাদাকে প্রাধান্য দেওয়া হত। যদিও অনেক ক্ষেত্রে দক্ষতা ও প্রতিভাকেও গুরুত্ব দেওয়া হত। মনসবদারি পদের জন্য সবচেয়ে বড়ো দাবিদার ছিল কর্মরত মনসবদারদের পুত্র ও বংশধরগণ। এদের বলা হত 'খানাজাদ'। এ ছাড়াও দেশীয় রাজন্যবর্গ ও প্রভাবশালী স্থানীয় জমিদাররাও মনসবদার নিযুক্ত হয়ে শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হত। জমির ওপর জন্মগত অধিকার ও স্থানীয় প্রভাবের জোরে এরা প্রায়শই রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করে দিত। মোগল সাম্রাজ্যের সংহতির পক্ষে এরা বিপজ্জনক হয়ে উঠত। আকবর এই শ্রেণিকে মনসবদার হিসাবে নিযুক্ত করে শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করে নেন। আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও মোগল শাসকশ্রেণির মধ্যে এদের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। আত্হার আলির হিসারমতো আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথম পর্বে (১৬৫৮-৭৮) ৪৮৬ জন উচ্চপদাধিকারী মনসবদারের মধ্যে ৬৮ জন ছিল জমিদার শ্রেণিভুক্ত। দ্বিতীয় পর্বে (১৬৭৯-১৭০৭) ৫৭৫ জন পদস্থ মনসবদারের মধ্যে জমিদার ছিল ৮১ জন। তা সত্ত্বেও জমিদারদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। মধ্য ভারতে, রাজস্থানে ও দাক্ষিণাত্যের পার্বত্য অঞ্চলে তারা যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল।

খানাজাদ বা কর্মরত মনসবদারদের পুত্র ও বংশধর

দেশীয় রাজন্যবর্গ ও জমিদার

আত্হার আলির হিসাব

আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

খানাজাদ, দেশীয় রাজা ও জমিদারশ্রেণি ছাড়া শাসকশ্রেণির মধ্যে একটি বড়ো অংশ ছিল বহিরাগত অভিজাত। মোরল্যান্ড দেখিয়েছেন আইন-ই-আকবরীতে মনসবদারদের যে তালিকা আছে, তার মধ্যে যাদের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা যায় তার প্রায় সত্তর শতাংশ পরিবার হয় হুমায়ুনের সঙ্গে ভারতে এসেছেন, অথবা আকবরের সিংহাসনে আরোহণের পর ভারতে প্রবেশ করেছেন। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথম পর্বে এক হাজার জাট পদমর্যাদার ৪১৭ জন মনসবদারের মধ্যে ২০২ জন ছিল বহিরাগত। দ্বিতীয় পর্বে একই পদমর্যাদার ৪৮২ জন মনসবদারের মধ্যে বহিরাগতর সংখ্যা ছিল ১৯৭। বহিরাগত মনসবদারের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার জন্য আত্হার আলি মধ্য এশিয়ার রাজনৈতিক অবক্ষয়কে দায়ী করেছেন। এম. এন. পিয়ারসন অবশ্য মনে করেন, বিদেশি সামরিক অভিজাত শ্রেণির কাছে ভারত যে আর আকর্ষণীয় ছিল না তার কারণ মোগল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা। আকবর এই বহিরাগত অভিজাতদের ভারতীয়করণের চেষ্টা করেছিলেন। তবে দীর্ঘদিন ভারতে বসবাস করে আদি বাসভূমির সঙ্গে তাদের কার্যত কোনো যোগাযোগই ছিল না।

মোরল্যান্ড শাসকশ্রেণির বড়ো অংশই বহিরাগত

আত্হার আলি ও পিয়ারসন

ক্রমশ তাদের ভারতীয়করণ সম্পন্ন

মোগল শাসকশ্রেণি কখনই সমজাতীয় হয়ে উঠতে পারেনি। তাদের মধ্যে বহু উপজাতীয় ও ধর্মীয় উপদলের অস্তিত্ব ছিল। বহিরাগত অভিজাতদের মধ্যে তুরানিরা এসেছিল মধ্য এশিয়ার তুরান অঞ্চল থেকে। তারা ছিল তুর্কিভাষী। ইরানিরা এসেছিল

তুরানি, ইরানি

Scanned by CamScanner

পারস্য, আফগানিস্তান ও ইরাক থেকে। তারা ছিল ফারসিভাষী। ধর্মীয় মতবাদে তুরানিরা ছিল সুন্নি, ইরানিরা শিয়া। উভয়গোষ্ঠীর মধ্যে কিছুটা রেষারেষি ছিল। মোগল বাদশাহগণ তুরানি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও এর প্রতি কোনো পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না। এ ছাড়া ছিল আফগান, শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমান, রাজপুত, দক্ষিণি ও মারাঠা অভিজাত।

আফগান

আফগানদের বহিরাগত বলা যায় না। কারণ ভারতে মোগলদের আগমনের পূর্ব থেকে তারা বসবাস করত। পানিপথের যুদ্ধে আফগান লোদীদের বাবর পরাস্ত করলেও অনেক আফগান নেতা তাঁর সঙ্গে সন্ধি করে নেয়। সুর বংশীয় আফগান শের শাহের জয়ের পর মোগলরা পুনরায় আফগানদের সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। আকবরকে পূর্ব ভারতে আফগানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়েছে। জাহাঙ্গীর আফগানদের সঙ্গে সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। খান-ই-জাহান লোদীর বিদ্রোহের জন্য শাহজাহানের শাসনকালে মোগল-আফগান সম্পর্ক নষ্ট হয়। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বিজাপুর অধিকৃত হলে সেখানে চাকুরিরত আফগান নেতাগণ মনসবদার হিসাবে মোগল শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। আফগানদের মধ্যে উপজাতীয় চেতনা প্রবল ছিল। ফলে তাদের সংখ্যাবৃদ্ধি মোগল শাসকশ্রেণির সংহতিকে দুর্বল করেছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন।

প্রবল উপজাতীয় চেতনা

শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমান

শাসকশ্রেণির মধ্যে শেখজাদা বা ভারতীয় মুসলমানগণ ছিল কিছু বিশেষ উপজাতির অন্তর্ভুক্ত, যেমন বারহার সৈয়দ ও কাম্বু। আকবরের শাসনকালে এই উপজাতি দুটি খুবই প্রভাবশালী ছিল। পরবর্তীকালে এদের প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। আওরঙ্গজেব এদের সন্দেহের চোখে দেখতেন বলে তাঁর সময় মনসবদারদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমানের সংখ্যা হ্রাস পায়। তবে তাঁর শাসনকালে বহু কাশ্মীরি মুসলমান উচ্চরাজপদে যোগ দেয়।

আকবর—জাতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা

রাজপুত

সামরিক ও রাজস্ববিভাগে নিযুক্ত

আকবরের শাসনকাল থেকে বহুসংখ্যক রাজপুত রাজন্য মনসবদার হিসাবে মোগল শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হয়। অন্যান্য মনসবদারদের সঙ্গে তাদের সমান মর্যাদা দেওয়া হয়। তা ছাড়া ক্ষত্রিও কায়স্থবর্ণের হিন্দুরা রাজস্ব বিভাগের উচ্চপদে নিযুক্ত হয়। তোডরমল ও রাই পত্রদাসের মতো হিন্দু সামরিক কর্তব্য পালন করা ছাড়াও রাজস্ব ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারসাধন করেন। রাই পুরুষোত্তমের মতো ব্রাহ্মণ বক্সী পদে নিযুক্ত হন। আকবরের সময় সুবাগুলি পুনর্গঠিত হলে ১২টি সুবার দেওয়ানদের মধ্যে ৮ জন ছিল ক্ষত্রি ও কায়স্থ। অতএব আকবরের শাসনকালে শাসকশ্রেণির মধ্যে জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এক ভারসাম্য স্থাপন করা সম্ভব হয়েছিল। সতীশ চন্দ্র একে 'মিশ্র শাসকগোষ্ঠী' আখ্যা দিয়েছেন। দশম শতাব্দীতে রচিত নিজাম-উল-মুল্কের সিয়াসৎনামা গ্রন্থে বলা হয়েছিল অভিজাত শ্রেণি ও সেনাবাহিনীতে কোনো বিশেষ জাতিগত গোষ্ঠীর প্রাধান্য থাকা উচিত নয়। সেক্ষেত্রে শাসক সেই গোষ্ঠীর ওপরই নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন। সেই সময় শাসকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত সকলেই ছিল মুসলমান। সতীশ চন্দ্র দেখিয়েছেন, আকবর এই তত্ত্ব অনুসারেই অভিজাত শ্রেণি ও সেনাবাহিনীতে হিন্দু, বিশেষ করে রাজপুতদের অন্তর্ভুক্ত করেন যাতে তারা অপর গোষ্ঠীগুলির বিরুদ্ধে বিপরীত বল হিসাবে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন জাতিগত ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর অস্তিত্ব শাসকশ্রেণির মধ্যে এক ভারসাম্য গড়ে তোলে যা একটি অখণ্ড শাসকশ্রেণির গঠনের পথ প্রশস্ত করে। পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেব রাজপুতদের নিয়োগ ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে কিছুটা সংকীর্ণ নীতি অনুসরণ করলেও আত্হার আলি দেখিয়েছেন, গোষ্ঠী হিসাবে রাজপুতরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। জয় সিংহ সওয়াই ও যশোবন্ত সিংহের মতো রাজপুত দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শাসনকালের প্রথম পর্বে রাজপুতদের নিযুক্তির হার ছিল ১৬.৬ শতাংশ, শেষপর্বে ১৭.৬ শতাংশ। তবে সাধারণভাবে আওরঙ্গজেব উচ্চপদে রাজপুতদের নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন না।

'মিশ্র শাসকগোষ্ঠী'

অন্যান্য গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিপরীত বল

আওরঙ্গজেবের শাসনকালেও রাজপুত প্রভাব অব্যাহত

দক্ষিণি মনসবদার

Scanned by CamScanner

মোগলদের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় দক্ষিণি রাজ্যগুলির অনেক রাজকর্মচারী মোগলপক্ষে যোগ দিয়ে মনসবদারের মর্যাদা লাভ করে। এদের বলা হত দক্ষিণি মনসবদার। রাজনৈতিক কারণে হাতে রাখার জন্য দাক্ষিণাত্যের বাইরে এদের ভালো জাগীর দেওয়া হত। সেইজন্য অন্যান্য মনসবদারগণ তাদের অপছন্দ করত। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে বহু সংখ্যায় মারাঠা সামরিক ও রাজস্ব বিভাগে কাজ করত। শাহজাহানের দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় থেকেই মারাঠাদের মোগল প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা শুরু হয়। শিবাজীর উত্থানের পর থেকে এই উদ্যোগ আরও জোরদার হয়। আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বহু মারাঠা মোগল মনসব গ্রহণ করে উচ্চরাজপদে আসীন হয়। কিন্তু মারাঠাদের আনুগত্য ছিল শিথিল। তারা অতি সহজেই মোগলপক্ষ ত্যাগ করত। ফলে মোগল শাসকশ্রেণিতে রাজপুতদের মতো তারা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে পারেনি।

দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিতে সামরিক ও রাজস্ব বিভাগে মারাঠাদের অন্তর্ভুক্তি

মারাঠাদের মোগল মনসব গ্রহণ

রাজপুতদের মতো প্রভাবশালী নয়

দক্ষিণি ও মারাঠাদের অন্তর্ভুক্তির ফলে মোগল শাসকশ্রেণির গঠনে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা দেয়। সামগ্রিকভাবে হিন্দু মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও রাজপুতদের সংখ্যা হ্রাস পায়। আফগান মনসবদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তুলনামূলকভাবে তুরানি, ইরানি ও বারহার সৈয়দদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। শাসকশ্রেণির গঠনে এই পরিবর্তনের ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় উচ্চবংশমর্যাদাসম্পন্ন খানাজাদ অভিজাতবর্গ। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে মোগল শাসকশ্রেণি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হয়। তাদের সাংগঠনিক কাঠামো ভেঙে পড়তে থাকে। নিজেদের মধ্যে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জাঠ, সৎনামী ও শিখ বিদ্রোহ এবং রাজপুতদের একাংশের বিরোধিতার ফলে মোগলদের রাজনৈতিক সংকট বৃদ্ধি পায়। তাদের সামরিক মর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হয়। মারাঠা শক্তির বিরুদ্ধে মোগল সেনাপতিদের ব্যর্থতা ও সুরাট বন্দরের লুণ্ঠন প্রভৃতি মোগলবাহিনীর অপরাজেয়তার ধারণাকে ধূলিসাৎ করে দেয়। আওরঙ্গজেব দীর্ঘদিন দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে ব্যস্ত থাকায় সেনাপতিদের মনোবল ভেঙে পড়ে ও তাদের তৎপরতা হ্রাস পায়। এম. এন. পিয়ারসন ও রিচার্ডসের মতো ঐতিহাসিকগণ স্পষ্টই বলেছেন, অনেক মোগল রাজপুরুষ ধরেই নিয়েছিলেন যে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটতে চলেছে। এরসঙ্গে যুক্ত হয় তীব্র জাগীরদারি সংকট। অধিকাংশ মনসবদারই তাদের জাগীর থেকে প্রাপ্য আয়ের ভগ্নাংশ মাত্র পেত। ফলে মোগল চাকরিতে অনেকেই নিরাপদ বোধ করছিল না। বাদশাহের প্রতি আনুগত্যেও চিড় ধরে। মোগল শাসকশ্রেণির কর্তব্যবোধও চূড়ান্তভাবে হ্রাস পায়। অতএব জাতি, ধর্ম, অঞ্চল ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে এক মিশ্র শাসকশ্রেণি গড়ে তোলার আকবর অনুসৃত নীতি তাঁর উত্তরাধিকারীগণও মেনে চলেন। কিন্তু সার্বিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটলে শাসকশ্রেণি তার সহজাত কর্তব্য ও আনুগত্যবোধ হারিয়ে ফেলে।

শাসকশ্রেণির গঠনে পরিবর্তন

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট

মোগলবাহিনীর মর্যাদা ক্ষুন্ন

আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে ব্যস্ত

সেনাপতিদের মনোবল ভগ্ন

জাগীরদারি সংকট

শাসকশ্রেণির আনুগত্য ও কর্তব্যবোধ হ্রাস

Scanned by CamScanner